ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 49-53
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.007

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার: একটি আলোকিত জীবন

ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী), *সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীপৎ সিং কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
E mail: debjanitwishaa@gmail.com

Received: 05.09.2024; Accepted: 25.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

Renowned linguist Sunitikumar Chattopadhyay was an eminent scholar. He educated people through righteous living and showed compassion to all. His most important work is O.D.B.L. (The Origin and Development of the Bengali Language), which studies the Bengali language and determines its etymology. Rabindranath Tagore respected his genius. He wrote many books on language, literature, human culture, and more. Sunitikumar led a very happy personal life and was known for his discipline and conscientious nature. He also had a great sense of humor, and his presence enlightened those around him.

**Key words: Linguist, Etymology, Compassion, Scholar, Culture.*

প্রকৃত লোকশিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর সুষ্ঠু জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নামটির মধ্যেই যেন একটা পাহাড়প্রমাণ উচ্চতা। পাণ্ডিত্য তাঁর অগাধ, সে তো সকলেই স্বীকার করবেন; মানুষ হিসেবেও তিনি যে কতটা উদার তথা মানবিক ছিলেন সেটা তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মাধ্যমে জানতে পারা যায়। তাঁর ছাত্রী বিদুষী সুকুমারী ভট্টাচার্য 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়' নামক গ্রন্থে একস্থানে বলেছেন ---'সুনীতিকুমারের মননের আর একটি বড়ো দিক হল সর্বমানবে সমদৃষ্টি। তাঁর মনোজগতে মানুষ ছোটো বা বড়ো শুধু মনুষ্যত্বে, চরিত্রে ও জ্ঞানবুদ্ধিতে। অন্যথা সকলে সমান।'[১] একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সুকুমারীদেবী। সেটি হল---আফ্রিকা ভ্রমণ সেরে গাড়িতে এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার পথে মাঠের মধ্যে কিছু প্রায়-নগ্ন আদিম অধিবাসীর গোল হয়ে বসে কিছু একটা খাওয়া দেখে কৌতূহলী তথা জনদরদী সুনীতিবাবু সেটি তাঁদের থেকে নিয়ে চেখে দেখেছিলেন। শুনে ছাত্রী সুকুমারী জানতে চেয়েছিলেন যে,তাঁর শরীরে সইবে ওই খাবার? তখন সুনীতিবাবু তাঁকে বলেছিলেন 'সইবে না কেন, মানুষই ত ওটা খাচ্ছিল'।[২]

সুনীতিকুমারের মতে ভারতের সংস্কৃতি মূলত মিশ্র। কোনও একটি জাতি বা ধর্মের মানুষ নিয়ে এটি গড়ে ওঠে নি। বরং এটি নানা জাতির তথা ধর্মের মানুষের সংমিশ্রণের ফল। যাঁদের আবার ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতের আর্য ও অনার্য--বিশেষত দ্রাবিড় , অস্ট্রিকভাষী অনার্যদের শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহের সমবায়ের ফলই হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি। অহিংসা হল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম দিক। অহিংসার কথা রয়েছে ভারতীয় বেদ-উপনিষদ, বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থে। অহিংসা শুধুমাত্র জীবের প্রতি

হিংসাপ্রদর্শন থেকে বিরত থাকাই নয়--- এর পেছনে রয়েছে করুণা ও মৈত্রী৷ অর্থাৎ সকলকে দরদের চোখে দেখা ও মিত্রতা বজায় রেখে মঙ্গলকামনা করা--বলে তিনি মনে করেন৷ তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ৷ সব ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল সংস্কৃতির প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল৷ এই বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন তাঁর 'ভারত-ব্রহ্ম: বাঙ্গালীর সাহিত্য সংস্কৃতি' নামক অভিভাষণে৷

সুনীতিকুমারের জন্ম ১৮৯০ সালের ২৬ নভেম্বর৷ অর্থাৎ এ বছর(২০২৪) তাঁর ১৩৫তম জন্মদিন৷ বাবা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন টার্নার মরিসন য়্যাণ্ড কোম্পানির একজন কেরানি৷ মা কাত্যায়নী দেবী৷ তিনি যদিও সুনীতিকুমার যখন মাত্র বারো বছরের তখনই মারা যান৷ পৈতৃক ভিটে উত্তর কলকাতার ৬৪ নম্বর সুকিয়াস স্ট্রিটে৷ ছোট থেকে বেড়ে ওঠা দারিদ্র্যকে সঙ্গী করেই৷ অভাবের কারণে মায়ের শেষকাজটিও কোনওরকমে হয়েছিল৷ ছোটবেলায় তাঁর পোলিও হয়েছিল, ফলে দৃষ্টিশক্তি যায় কমে। কিন্তু অনন্যসাধারণ মেধার জোরেই জীবনে সফল হন তিনি৷

১৯০৭ সালে মোতিলাল শীল প্রতিষ্ঠিত ফ্রি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করার পরে ১৯০৯ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে সাম্মানিক স্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আবার ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পর্বেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ছাত্রজীবনেই স্কটিশ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বেশ কিছু যশস্বী অধ্যাপকের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। যেমন ড.আর্কহার্ট, ড. স্টিভন, অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এইচ এম পার্সিভাল, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মনমোহন ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ। পাশাপাশি গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, তামিল ইত্যাদি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও তিনি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, সঙ্গীত, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়েও।

এম এ পাশ করার পরে তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ বিভাগে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি পেলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি। এর জন্য তিনি 'অ্যান এসে টুওয়ার্ডস অ্যান হিস্টোরিকাল অ্যান্ড কম্পারেটিভ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' বিষয়ে যে গবেষণাপত্রটি লিখেছিলেন তার শিরোনাম ছিল 'দ্য সাউন্ডস্ অব মডার্ন বেঙ্গলি'। ১৯১৭ সালে জুবিলি রিসার্চ পুরস্কার পেলেন কম্পারেটিভ ফিলোলজি উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু দ্য বেঙ্গলি ডায়লেক্টস্' বিষয়ক গবেষণাপত্রটির জন্য।

এহেন মেধাবী সুনীতিবাবুকে অসম্ভব পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ৷ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক অমিত রায়ের হাতে তিনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব। তাও আবার শিলং বেড়াতে গিয়ে তিনি এ বই পড়তে লাগলেন৷ গ্রন্থনামটি যদিও রবীন্দ্রকল্পিত৷ কিন্তু সুনীতিকুমারের প্রতি রবিঠাকুরের অকৃত্রিম স্নেহই এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল৷ উনত্রিশ বছরের ছোট সুনীতিকুমারের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল বলেই তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতেন তিনি৷ সমস্ত পৃথিবীর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সুনীতিকুমারের যে আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল তা অনেকটাই রবীন্দ্রসান্নিধ্যে৷ রবীন্দ্রনাথই তাঁকে দিয়েছিলেন 'ভাষাচার্য' উপাধি৷ রবিঠাকুরের ভাষাসংক্রান্ত অন্যতম গ্রন্থ 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮)-এর উৎসর্গপত্রে এই উপাধিটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ৷ ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি ইন্দোনেশিয়া, জাভা, সুমাত্রা, থাইল্যাণ্ড, মালয়, বালি ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করেন৷ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এ বলেছিলেন যে সুনীতিকুমারের ছিল 'বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি' মনের সজীব আগ্রহ৷ সত্যই তাই৷ এহেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিপুলকায় গবেষণা করেছেন-- যা 'ও ডি বি এল' নামে পরিচিত তথা প্রকাশিত। এই ভাষার শব্দসমূহের উৎস তিনি খুঁজেছেন প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে।

সুনীতিকুমারের মূল পরিচয় ভাষাতাত্ত্বিক হলেও সংস্কৃতির আনাচে কানাচেও তাঁর পরিক্রমণ লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় কালচার শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'কৃষ্টি' রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ ছিল। তাই তাঁরই অনুরোধে সুনীতিকুমার একটি যোগ্য শব্দ সন্ধান করতে থাকেন কালচারের বাংলা হিসেবে। তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে জানতে পারেন যে তাঁরা 'কালচার' অর্থে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করেন। তাই বাংলাতেও তিনি সংস্কৃতি শব্দটিকেই কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে পছন্দ করলেন-- যা রবীন্দ্রনাথ সাদরে গ্রহণ করলেন। বিশ্বের দরবারে তিনি 'ভারতের সাংস্কৃতিক দূত' হিসেবেই সম্মানিত হতেন। সুনীতিকুমারের মতে এই পৃথিবী --- সম্পর্ক, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির। এই পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'ইউরোপ ১৯৩৮'-এ।

১৯১৯ সালে তিনি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা তথা গবেষণার উদ্দেশ্যে তিন বছরের জন্য লণ্ডনে যান সরকারি বৃত্তি নিয়ে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা করেন এবং মাত্র দু বছরের মধ্যে ডি লিট ডিগ্রি পেয়ে যান। অধ্যাপক ড্যানিয়েল জোন্সের তত্ত্বাবধানে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল – 'ইণ্ডো-এরিয়ান লিঙ্গুইসটিক্স : দ্য ওরিজিন য়্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'। পণ্ডিত ড্যানিয়েল জোন্স ছাড়াও তিনি আরো কিছু পণ্ডিতপ্রবরের কাছে পাঠ নিয়েছেন। যেমন -- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে এফ ডব্লিউ টমাস, প্রাকৃত ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এল ডি বার্নেট, প্রাচীন আইরিস ভাষায় অধ্যাপক রবিন ফ্লাওয়ার, ফারসি ভাষায় স্যার ই ডেনিসন রস প্রমুখ তাঁকে শিক্ষা দেন। সুনীতিকুমার একজন প্রকৃত ভাষাপ্রেমী বলেই মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষারও অন্দরলোকে নিবিড় দৃকপাত করেছেন। প্রাচীন ইংরেজি ও গথিক ভাষাও অধ্যয়ন করেছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক চেম্বার্স ও গ্র্যটনের কাছে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের 'বেদ' তাঁর 'দ্য ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (ও ডি বি এল) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় দু খণ্ডে, ১৯২৬ সালে--যখন সুনীতিকুমারের বয়স মাত্র ছত্রিশ। ভাষার আলোচনায় বর্ণনামূলকতার স্থানে ঐতিহাসিক তথা তুলনামূলকতার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন ও প্রয়োগ করেন। আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবোধ। তিনি ভেবেছিলেন ভাষাকে শুধু যান্ত্রিকভাবে বর্ণনা করলেই চলবে না, প্রয়োজন তার আদিরূপ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিবর্তন পর্যায়গুলি অনুসন্ধান করা। ভাষার শব্দরূপ তথা ধ্বনিরূপের বিবর্তনের মাধ্যমে সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস যেমন স্পষ্টতর হয় তেমনই সেই বিবর্তনের সূত্রে ভাষার রূপমূলগুলি পরিবর্তনের নিখুঁত যুক্তিশীলতাও প্রতিভাত হয়।

বিভিন্ন ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যই তাঁকে ভাষাচার্যের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সকল ভাষাতাত্ত্বিক এহেন শিরোপা মেলেনি। ভাষাজিজ্ঞাসায় যুক্তিবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি পূর্বের দীর্ঘলালিত গতিতে অধিকতর বেগ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর সব থেকে বড় কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি ভাষাকে নীরস বিশ্লেষণ করেন নি। বরং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত জনজাতি ও তাঁদের সংস্কৃতিকেও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেটি আবার পরম্পরা সূত্রেও প্রোথিত। সেই জন্যই তো ভাষার প্রাচীন রূপ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিবর্তন ধারাটি বিশ্লেষণ করা জরুরি। আর সেই সূত্রে জাতির অতীত রূপটিও স্পষ্টতা পায়। ভাষাজিজ্ঞাসায় ঐতিহাসিক তথা তুলনামূলক পদ্ধতি আনয়নে সুনীতিকুমারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে উঠেছে। বহুবিদ্যার সমন্বয়ী আধার বলেই তাঁর পক্ষে এভাবে অনুভব করা সম্ভব হয়েছিল।

এমন সমৃদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিকের গার্হস্থ্যজীবনের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ সুস্থ সুন্দর ব্যক্তিজীবন না থাকলে কর্মসাধনায় বিঘ্ন অনিবার্য। এক্ষেত্রে বলতে হবে তিনি সৌভাগ্যশালী। পারিবারিক

প্রতিকূলতা তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। ১৯১৪-র ১৭ এপ্রিল তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কমলাদেবীর সঙ্গে, - তিনি ছিলেন বিষ্ণুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও বনলতা দেবীর প্রথম সন্তান৷ সুনীতিকুমার ও কমলাদেবীর ছয় সন্তান৷ তাঁদের পাঁচকন্যা হলেন--রুচি, রমা, নীলা, সতী, শুচি, একমাত্র পুত্র হলেন-- সুমন৷ স্ত্রীর প্রতি সুনীতিকুমার প্রবলভাবেই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল ও মমত্বপূর্ণ৷ ফলত তাঁদের বৈবাহিক জীবনও যথেষ্ট সুখের ছিল৷ যদিও প্রথমদিকে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল৷ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অমলিন দাম্পত্যজীবন তাঁদের৷ তবে ১৯৬৪ সালের ৮ডিসেম্বর পত্নীর মৃত্যু তাঁর জীবনে বড় আঘাত বয়ে আনে৷ স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলের সঙ্গে তিনি নিজেও পূর্ণ অশৌচ পালন করেছিলেন৷ তাঁর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর এত কিছু করণীয় ও ত্যাগের বিধান আছে, সেখানে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর কোনওরকম নিয়মনিষ্ঠা পালনের কোনও বিধান নেই,--এমনকি স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীর মৃত্যুর পরদিনই বিবাহও করতে পারে-- এ হল হিন্দুধর্মের একপ্রকার অবিচার।

কোনও বিষয়েই গোঁড়ামি তাঁর পছন্দ ছিল না৷ স্বয়ং নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাচরণ করতেন মূলত জীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য৷ কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অনুভব করতেন যে হৃদয় দিয়ে বিচার করলে মনে হয় ঈশ্বর আছেন কিন্তু মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করলে কিছু পাওয়া যায় না৷ তাঁর মতে ঈশ্বর থাকতেও পারেন নাও থাকতে পারেন৷ এই উদার তথা মুক্তমনা মানুষটির পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরেও অনেকগুলি বছর কেটে গেছে (১৯৭৭, ২৯মে)। কিন্তু তাঁর দেখানো পথই আমাদের আশ্রয় আজও৷

সুনীতিকুমার এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। সেই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও ছিলেন। কিন্তু অন্তরের অকৃত্রিম মানবতাবাদ তাঁকে করে তুলেছিল কুসংস্কারমুক্ত, উদার। ১৯৭৬ সালে অর্থাৎ তাঁর চিরবিদায়ের মাত্র এক বছর আগে রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর বলা রামসীতা ভাইবোন--- এই বিতর্ক নিয়ে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, তিনি যেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক বলিষ্ঠ একক সেনানী।

মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সমস্ত বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল। আবার ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম বিষয়েও তিনি প্রচুর পাঠ নিতেন এবং প্রত্যক্ষভাবেও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইতেন মানুষের সংস্পর্শে এসে। এক্ষেত্রে তাঁর মানুষের সঙ্গে মেশার সহজাত ক্ষমতার তথা বিনয়ী স্বভাবের প্রশংসা করতেই হয়।

আবার সঙ্গীতশাস্ত্রী না হলেও সঙ্গীত বিষয়ে একটা দীক্ষিত বোধ তাঁর ছিল। জীবনের শেষ আট-দশ বছর তিনি রাতে চোখে ভালো দেখতে পেতেন না বলে সন্ধ্যার পরে আর পড়াশোনা না করে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা ঘটক, অর্ঘ্য সেন প্রমুখের রবীন্দ্রসঙ্গীতের লং প্লেয়িং রেকর্ড শোনা তাঁর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভালোবাসতেন ধ্রুপদী সঙ্গীত। ডাগর ভাইদের অনুষ্ঠান তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ইউরোপীয় বা বিদেশি সঙ্গীতে বীঠোভেন ও বাক্ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। বিশেষত বীঠোভেনের 'এরইকা' ও 'ফিফথ্ সিম্ফনি'। রবিশঙ্করের বাজনার মুখ্য শ্রোতা ছিলেন ভাষাচার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গান তাঁর সংগ্রহে ছিল যেগুলি তিনি শুনতে খুব ভালোবাসতেন। এছাড়া তাঁর আঁকা বেশ কিছু মূল্যবান ছবির কথাও আমরা জানি।

আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় মূলত সিরিয়াস ভাষাতাত্ত্বিক বা বহু বিদ্যার একজন আকর হিসেবে৷ তবে মেধার সঙ্গে রসবোধ সহজাতভাবেই থাকে৷ সুনীতিকুমারের মধ্যেও তাঁর গাম্ভীর্যের আড়ালে সূক্ষ্ম রসবোধের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে৷ লেখক নারায়ণ সান্যালের 'লেঅনার্দোর নোটবই এবং...' গ্রন্থের 'গোপ্পদে প্রতিবিম্বিত পূষণ' প্রবন্ধটিতে তেমনই কিছু দৃষ্টান্ত মেলে৷ বেশ আমুদে মানুষকেই আমরা সেখানে খুঁজে পাই৷

লেখক নারায়ণ সান্যালের মেয়ের বিয়েতে এসে ফিশ ওলি খাবার সময় যে মজার ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন তা তো প্রায় সর্বজনবিদিত৷ তথ্য পরিবেশনের মধ্যেও নিছক মজা করে কথা বলার ভঙ্গিমাটি কিন্তু বেশ উপভোগ্য৷

আবার একবার সুনীতিবাবুকে নারায়ণবাবু 'আপনি' সম্বোধন করতে নিষেধ করলে সুনীতিবাবু বেশ কৌতুককর উত্তর দিয়েছিলেন---'না, না! ওটা আমার ধাতে নেই । 'আপনি-তুমি' রকমফের করতে হলে ঐ সঙ্গে ক্রিয়াপদগুলোকেও তো বদলাতে হয়৷ সে বড় বখেড়া৷ তাই আমার ছাত্রের ছাত্রকেও 'আপনি' বলি।'[৩]

একবার এম এ পরীক্ষা দেওয়া কিছু ছাত্র তাঁর কাছে আসেন, তাঁদের আবেদন যিনি হেড এক্সামিনার তিনি যেহেতু সুনীতিবাবুর ছাত্র তাই সুনীতিবাবু যেন তাঁর থেকে একটু জেনে নেন, ওঁদের মধ্যে কারা পাশ করেছেন৷ কারণ একটি চাকরির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যাতে প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল এম এ৷ এদিকে আবেদনের শেষ তারিখ তাঁদের ফলাফল প্রকাশের এক সপ্তাহ আগে৷ তখন সুনীতিবাবু তাঁদের বলেন যে ছাত্ররা যেন সেই এক্সামিনারের কাছেই সরাসরি জানতে চান বিষয়টি৷ তখন উপস্থিত এক ছাত্র বলে ওঠেন 'না স্যার উনি আমাদের দেখলেই খচে যাবেন।'[৪] সুনীতিবাবু স্বাভাবিক রসিকতা বোধ থেকেই উঠে পড়ে লেগে গেলেন সেই 'খচে যাবেন' শব্দটা ছাত্রের মুখ থেকে আবারও বের করতে৷ যথারীতি তিনি জানতে চাইলেন যে সেই এক্সামিনার তাঁদের দেখলেই কী হয়ে যাবেন? ছাত্রটি তো যথারীতি ঘাবড়ে গেছেন৷ তখন তাঁর এক সহপাঠিনী বললেন যে, রমেন বলছে তিনি ছাত্রদের দেখলেই চটে যাবেন৷ ভাষাচার্য তাঁকে থামিয়ে বললেন 'তুমি থাম মা লক্ষ্মী! প্রশ্নটা আমি রমেনবাবুকেই করেছি৷ উনি কী হয়ে যাবেন? কী বললে তুমি?'[৫] ছাত্রটি ততক্ষণে মনের জোর পেয়ে গেছেন, কাজেই বললেন যে চটে যাবার কথাই বলেছিলেন৷ সুনীতিকুমারও নাছোড়৷ তাঁকে বললেন শব্দটি ছিল ক-বর্গের৷ রমেনসহ তাঁর বন্ধুরা কিছুতেই যেন মনে করতেই পারলেন না শব্দটি৷ তখন প্রবল রসিক সুনীতিবাবু, গম্ভীরভাবে ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, তাহলে তাঁরা যেন চলে যান, তিনি কিছু করতে পারবেন না৷ অগত্যা ছাত্রদলের মুখপাত্র করুণভাবে কারণটি জানতে চাইলে তিনি জানালেন 'কারণ তোমাদের অনৃতভাষণে সুনীতিকুমার 'খচে' গেছেন।'[৬]

নিজে বেশ গুরুগম্ভীর থাকতেন অথচ হৃদয়ের প্রবল রসবোধে সব বিষয় নিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রসিকতা করতে পারতেন তিনি । আর এ জন্যই তাঁর সংস্পর্শে থাকার অভিজ্ঞতাটি সকলের কাছেই বড় উপভোগ্য ছিল৷ প্রবল পাণ্ডিত্যের অধিকারী তো ছিলেনই, তার সঙ্গেই মিশে ছিল সরস বাচনভঙ্গী---যা তাঁকে সকলের কাছে বড় প্রিয় করে তুলেছিল৷ এমন একটি আলোকিত জীবনের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও আলোকিত হয়েছেন। সমৃদ্ধ হয়েছেন।

সূত্র:

১) ভট্টাচার্য, সুকুমারী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫।
২) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮ ।
৩) সান্যাল, নারায়ণ, লেঅনার্দোর নোটবই এবং..., গোপ্পদে প্রতিবিম্বিত পূরণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৫ ।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭
৫) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭
৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭